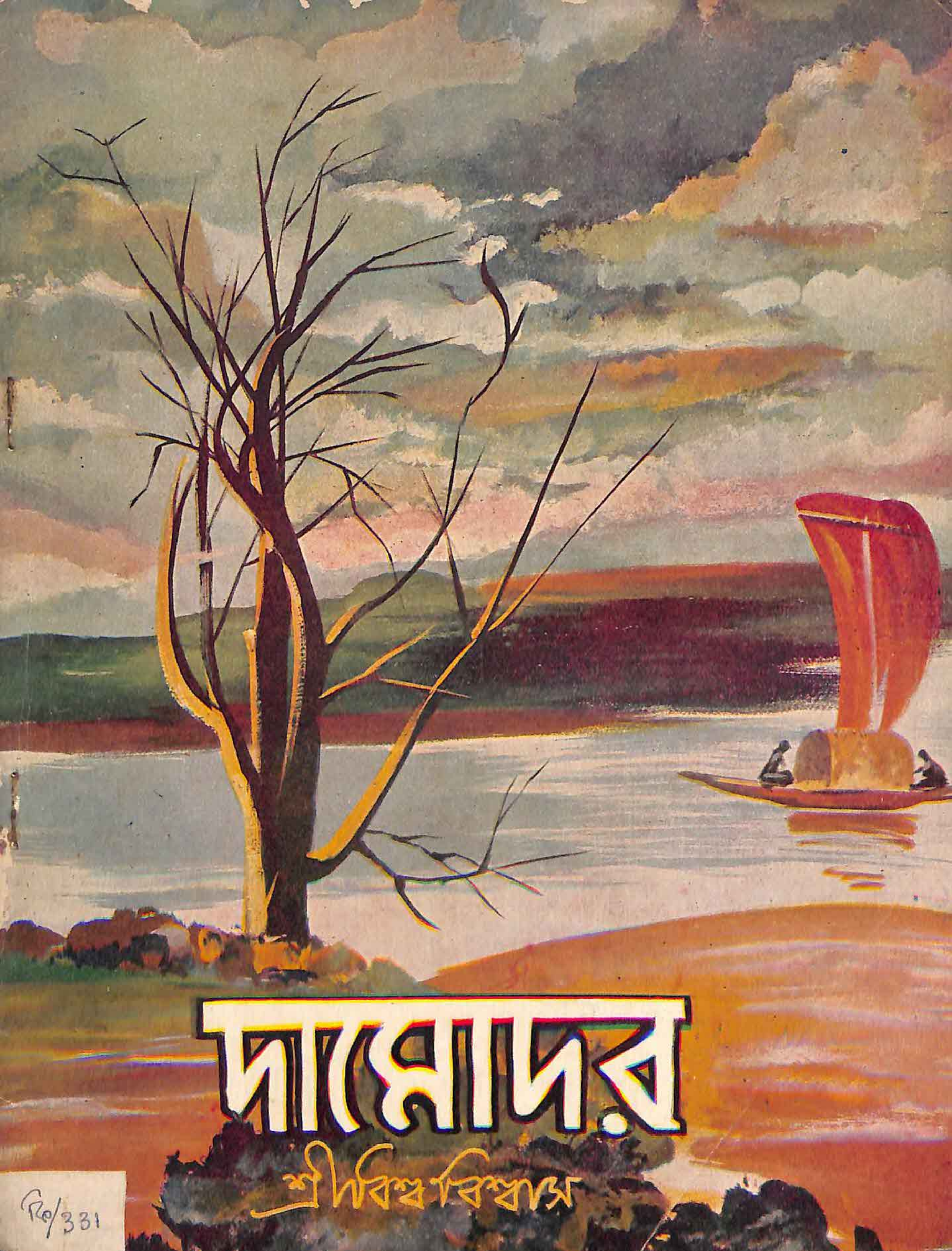


দামোদর

শ্রীবিশ্ব বিশ্বাস

দামোদর

শ্রীবিশ্ব বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৫৭

মূল্য ঃ পঁচিশ নয়া পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষা-অধিকারের পক্ষে, প্রচার-অধিকর্তা শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর কর্তৃক প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

শিশু এবং সদ্যসাক্ষর পাঠকের উপযোগী সাহিত্য রচনা সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনার একটি বিশেষ অঙ্গ। ঐরূপ সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে গত দুই বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক সাহিত্য-কর্মশালা আয়োজিত ও পরিচালিত হইতেছে। কোন বিশেষ সাহিত্য-ব্রতীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন নির্বাচিত লেখক লইয়া সাহিত্য কর্মশালা সংগঠিত হয়। নতুন আঙ্গিকে এবং বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে লেখকগণ নানা বিষয়ে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। দেড়মাস কাল তাঁহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিয়া রচনার বিষয়বস্তু, রচনার ভাষা এবং রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। পুনঃপুনঃ আলোচনা, সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে রচনাগুলি যতদূর সম্ভব নির্ভুল, সহজ ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠে।

১৯৫৬-৫৭ সনে বাণীপুরে দ্বিতীয় সাহিত্য-কর্মশালার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল শিশুভারতী-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উপর। ষোলজন লেখক এই কর্মশালায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় মোট ষোলখানা শিশু ও কিশোর-পাঠ্য বই রচিত হইয়াছে। এই বইখানি উহাদের অন্যতম। শিশু ও কিশোর পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সুবোধ্য, সহজ ও সরল ভাষায় বইগুলি লিখিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, বাঙলার শিশু ও কিশোর সম্প্রদায় এই বইগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিবে।

সাহিত্য-কর্মশালার পরিচালক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মিগণ যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

নিখিলরঞ্জন রায়,
সমাজশিক্ষার প্রধান পরিদর্শক,
শিক্ষা-অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

দামোদর

নদী আমাদের যে কত উপকার করে তা ব'লে শেষ করা যায় না। নদীর জল আমরা পান করি। আমাদের মালপত্র নিয়ে নৌকা চলাচল করে নদীর বুকে। নদীর জলে আমাদের চাষবাস হয়। মানুষের বসতি হয় তাই নদীর ধারে ধারে।

এত উপকারী যে নদী সেও নানান বিপদের কারণ হয় আমাদের। তোমরা যদি সেসব কথা শোন, তা হ'লে হয়তো নদীর উপর রাগ ক'রেই বসবে। বর্ষা-বাদলের দিনের কথা একবার ভাব তো। তখন বানের জলে নদীর দু'কূল ভেসে যায়। দু'পাশের মাঠ ছাপিয়ে বর্ষার জল ছুটে চ'লে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ধানের মাঠ ভাসিয়ে, গ্রামের পথ ডুবিয়ে জল প্রবেশ করে লোকালয়ে। মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যায় নিরাপদ জায়গায়। কুটিরের পর কুটির জলের টানে নিশ্চিহ্ন হয়। গোরু-বাছুর মানুষ ভেসে যায়। ভাব দেখি কি দুর্দশা হয় মানুষের তখন।

দোষ কিন্তু নদীর নয়। দুষ্টু ছেলেমেয়ে তো দুষ্টুমি করবেই। মাস্টার মশায় যদি শাসন না করেন তা হ'লে মাস্টার মশায়ের দোষ। তেমনি নদীকেও শাসন করা চলে। বাঁধ দিয়ে বানের জল আটকান যায়।

তোমরা হয়তো দেখেছ বর্ষাকালে ফসলের ক্ষেতে জল জমে। এতে জমি খারাপ হয়ে যায়। জলনিকাশের দরকার হয় তখন। খাল কেটে জমা জল বার করা যায়। আবার খাল দিয়ে চাষের জমিতে বানের জলের সাথে পলিমাটিও আসে। জমিও ভাল থাকে। ফসলও হয় ভাল।

দুষ্টু নদীকে শাসন করলে কত উপকার পাওয়া যায় দেখছ তো। তা না ক'রে আমরা যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি অপকার তো হবেই। মানুষ মরবে, গ্রাম ভাসবে, ফসল নষ্ট হবে আর মাঠ হবে খালি।

আমরা যদি তখন নদীর উপর রাগ ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকি, আমাদের দুর্গতি বাড়বে ছাড়া কমবে না। আমরা তখন বাঁধ দিতে পারি। বাঁধ দিলে বানের জল আসবে না। খাল কাটলে চাষের জমির জল নিকাশ হবে। খেতের ফসল বাড়বে। নদীর বান প্রতিরোধ করলে সেই বাড়তি জল লাগবে নানান কাজে। তোমরা হয়তো বলবে এভাবে কাজ করা হচ্ছে না কেন? এদ্দিন করা হয় নি। এখন করা হচ্ছে। আজ ক'বছর হ'ল ইংরেজ আমাদের দেশ ছেড়ে চ'লে গেছে। এখন আমরা স্বাধীন। আমাদের দেশের অবস্থা এখন আবার একটু একটু ক'রে ভাল হচ্ছে।

তোমরা দামোদরের নাম নিশ্চয় শুনেছ। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই নদকে লক্ষ্য ক'রে একদিন লিখেছিলেনঃ

"বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ
ক্ষীরসম স্বাদু নীর।"

কবির কথা সত্যি। কিন্তু বছর বছর বান আসায় হ'ত বিপরীত। বানে দেশ দেশান্তর ভাসত। অজন্মা হ'ত। দুর্ভিক্ষ আর ম্যালেরিয়ায় লোক মরত হাজার হাজার। ১৯৪৩ সনে এমনই একটা বান আসে দামোদরের বুকে। তারপর দামোদরের বন্যা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হ'ল। তার ফলে দামোদর পরিকল্পনার সূত্রপাত।

ইংরেজ রাজত্ব যতদিন ছিল ততদিন এই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা হয় নি। স্বাধীনতা পাবার পর সেই চেষ্টা শুরু হয়েছে। টেনেসি পরিকল্পনার অনুকরণে দামোদর পরিকল্পনার কাজ করা স্থির হয়। আমেরিকার একটি নদীর নাম টেনেসি। মিসিসিপি নদীর শাখা-নদী। টেনেসি নদীতে আগে নৌকা চলাচল হ'তে পারত না, আর বন্যা হ'ত ফি বছর। এই নদীর উপর এখন বাঁধ হওয়ায় টেনেসির উপত্যকা সমৃদ্ধ হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। স্বাধীনতার পর ভারত-সরকার টেনেসির মতন দামোদরের উপর বাঁধ তৈরি করতে মনস্থ করলেন। ফলে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বা এক কথায় ডি ভি সি-র সৃষ্টি হ'ল ১৯৪৮ সনের শেষাশেষি।

দামোদর পরিকল্পনার কাজ অনেক। টেনেসির আশেপাশের রাজ্যের যেরূপ উন্নতি হয়েছে দামোদর পরিকল্পনায় রাঢ় বাঙলার সেইরূপ উন্নতি হবে আশা করা যায়। রাঢ় দেশ বলতে আমরা বুঝি বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া জেলা।

এই কয়টা জেলা নিয়েই দামোদর উপত্যকা। দামোদর পরিকল্পনার কাজ এক-আধটা নয়, অনেকগুলো। এক-একটা ক'রে বলি। শোন!

১। বন্যা নিবারণ,
২। জলনিকাশ,
৩। জলসেচ,
৪। ম্যালেরিয়া নিবারণ,
৫। জলপথে চলাচল,
৬। পানীয় জল সরবরাহ,
৭। বিদ্যুৎ সরবরাহ,
৮। শিল্প স্থাপন,
৯। শহর গঠন,
১০। আধুনিক জীবনযাত্রার পত্তন।

চার হাজার বছর ধ'রে আমাদের দেশে চলে আসছিল বন্যার জল দিয়ে সেচ। জলসেচ আর জলনিকাশের জন্য কৃত্রিম খাল কাটা ছিল। বছরের অর্ধেক আমাদের দেশে বর্ষাকাল। মাঠ থেকে বৃষ্টির জল খালে এসে পড়ায় মাঠে জল জমে থাকত না এবং খালে খালে গ্রীষ্মের জন্য জল জমা থাকত। বর্ষায় নদীর বুক ফুলে উঠত। খালগুলো নদীর জলের পলিমাটি আশে পাশের মাঠে তুলে দিত। ফলে বন্যারোধ, জলনিকাশ, জলসেচ আর ম্যালেরিয়া নিবারণ হ'তে পারত। কৃত্রিম ঐ খালগুলোর নাম কানা নদী। রাজনৈতিক গোলমালে পরে খালগুলো সাফ্ হ'ত না। ফলে আমাদের প্রাচীন সেচব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। সে আজ তিনশ' সাড়ে তিনশ' বছর আগেকার কথা।

জলসেচ ব্যবস্থার অভাবে সুজলা সোনার বাংলা ধীরে ধীরে শ্মশানের পথে চলল। মাঠ থেকে বর্ষার জল বার হ'তে পারল না। জমি খারাপ হ'তে লাগল আর বদ্ধ জলে মশা জন্মাল। মশা থেকে ম্যালেরিয়া এল। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। জলসেচের খালগুলো মজতে লাগল আর তাই পলিমাটিযুক্ত নদীর জল আর আশে পাশের মাঠে উঠতে পারল না। জমির উর্বরতা কমতে লাগল। মাঠে মাঠে অজন্মা দেখা দিল। ঘরে ঘরে এল মহামারী ম্যালেরিয়া। বাঙলার চাষীর গোলাভরা ধান আর গলাভরা গান হ'ল অতীতের স্বপ্ন। বিদেশী শাসনের অবসান আজ এই দশটি বছর। এই দশ বছর মরণোন্মুখ বাঙলাকে নূতন ক'রে গড়বার ভার পেয়েছি আমরা। দেশের বড় বড় লোকরা ভেবে ঠিক করেছেন নূতন ও আধুনিক কোন জলসেচ ব্যবস্থা শুরু না করলে আমাদের বাঁচবার উপায় নেই। সে রকম একটা ব্যবস্থা করার জন্যই দামোদরের বুকে বাঁধ পড়ছে। কি কি বাঁধ তৈরি করবার কথা তাও তোমাদের বলছি। নামগুলো শোনঃ—

তিলায়াঃ

বরাকর ও দামোদরের মিলনস্থান হইতে ত্রিশ মাইল দূরে বরাকর নদীর উপর।

কোনার—এক নং, দুই নং, তিন নংঃ

হাজারিবাগ জেলার ভিতর। কোনার ও দামোদরের মিলনস্থান হইতে উনিশ মাইল দূরে কোনার নদীর উপর।

বোকারোঃ

হাজারিবাগ জেলার ভিতর। বোকারো ও কোনার নদীর মিলনস্থান থেকে বার মাইল দূরে।

মাইথনঃ

মানভূম জেলার ভিতর। বরাকর ও দামোদরের মিলনস্থানের আট মাইল দূরে।

পাঞ্চেটঃ

মানভূম জেলার ভিতর। বরাকর ও দামোদরের মিলনস্থানের তিন মাইল দূরে।

এ পর্যন্ত যে ক'টা বাঁধের কথা বললাম সেগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আর ক'টা বাঁধের কাজ এখনও শেষ হয় নি। কিছু কিছু কাজ হচ্ছে মাত্র। সেগুলোর নাম এখন বলি শোনঃ

আয়ারঃ

হাজারিবাগ জেলার ভিতর। দামোদর ও আয়ারের মিলনস্থানের সাতাত্তর মাইল দূরে।

বারমোঃ

দামোদর ও বরাকরের মিলনস্থানের তিপ্পান্ন মাইল দূরে।

বনপাহাড়িঃ

দামোদর ও বরাকরের মিলনস্থানের চুয়াল্লিশ মাইল দূরে বরাকর নদীর উপর।

নদী নিচে নামে পাহাড়ের উপর থেকে। যখন সে পাহাড় থেকে নামে তখন সে নামে ঝরনার মত। দামোদরও তাই। তিন হাজার পাঁচশ' চার ফুট উঁচু পালামৌ জেলার খামারপাট পাহাড়ে দামোদরের জন্ম। বরকাখানা ও ডালটনগঞ্জ রেলপথের টৌরি স্টেশন হইতে মাত্র আট মাইল দূরে অবস্থিত খামারপাট পাহাড়। পাহাড়ের পাঁচটি ঝরনা। তন্মধ্যে সোনাসাথী নামক ঝরনা হচ্ছে দামোদর। ঝরনা হয়ে দামোদর দু' হাজার ফুট নিচে সমতল ভূমিতে নামছে। উঁচু থেকে নামছে নিচে, তাই চওড়া কম, গভীর বেশি। এমনিভাবে দামোদর হাজারিবাগ জেলায় প্রবেশ করছে। এখান থেকে দামোদরের যত শাখানদীর উৎপত্তি। সমগ্র হাজারিবাগ জেলা ও রাঁচি, সাঁওতাল-পরগনা ও মানভূম

জেলার কিয়দংশের উপর দিয়ে দামোদর প্রবহমান। আসানসোল কয়লা শহরের দক্ষিণ দিকে গিয়ে বর্ধমান ও বাঁকুড়ার সীমান্ত ধ'রে, পরে বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে দামোদর কলকাতা শহরের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে হুগলি নদীর সাথে মিশেছে। আগে দামোদর ছিল চওড়া কম, গভীর বেশি। যত অগ্রসর হয় তত চওড়া হয় বেশি, গভীর হয় কম। আসানসোলের কাছাকাছি যখন দামোদর আমাদের বাঙলা দেশে প্রবেশ করল তখন দামোদর দু'ধারে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হ'ল আর তার গভীরতা কমল। বাঙলাদেশে দামোদর অগভীর তাই বর্ষার জল দাঁড়ায় না। দুকূল ভাসিয়ে চ'লে যায়। ফলে হয় বন্যা। নষ্ট হয় চাষ। ফসল ফলে না। দুর্ভিক্ষ হয়। আর যখন বৃষ্টির জল সরতে থাকে তখন মাঝে মাঝে আটকে-পড়া স্বল্প জলে মশা জন্মে ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে। অনাহারে আর রোগে দামোদর উপত্যকার মানুষরা তাই হাজারে হাজারে ফি বছর মৃত্যুপথের পথিক হয়। এর জন্য দায়ী বন্যা। বন্যা নিবারণ করবার জন্য বাঁধ দিয়ে জল আটকান দরকার। দামোদরের বুকে তাই পর পর কয়টি বাঁধ নির্মাণের কাজ হচ্ছে। তিলায়া আর কোনার বাঁধের কাজ শেষ হয়েছে। মাইথন আর পাঞ্চেট বাঁধের কাজ শেষ হয়ে আসছে। এই ক'টা বাঁধের দ্বারা বন্যা নিবারণ হবে, ক্ষেতে ফসল হবে আর ম্যালেরিয়া দূর হবে।

বাঁধগুলো দ্বারা জলসেচ আর জলনিকাশের কাজও হবে প্রচুর। তিলায়া, কোনার, মাইথন আর পাঞ্চেট বাঁধের জমা জল দুর্গাপুর জলাধারে যাবে এবং খাল-বিলের মাধ্যমে রাঢ় দেশের জমিতে জলসেচন করবে। এর জন্য দামোদরের দু'ধারে খাল বার হচ্ছে। মজা বিল থেকে জলনিকাশের জন্যও খাল হচ্ছে। দামোদরের বাঁ ধারের খাল হুগলি নদীর সাথে যুক্ত হচ্ছে খন্যান্যের কাছাকাছি।

দামোদর পরিকল্পনার সাথে প্রাচীন কালের সেচব্যবস্থার আকাশ-পাতাল তফাত। প্রাচীন কালের সেচব্যবস্থায় নদীর পাড়ে বাঁধ দিয়ে আর খাল কেটে বন্যার জলে জলসেচ ও জলনিকাশ হ'ত। দামোদরের বর্তমান বাঁধগুলোর দ্বারা কাজ হবে আরও

নানান রকম। আগে কোনদিন এসব হয় নি। দু' একটা কাজের কথা এখন বলা যাক। ঐ যে খালগুলোর কথা বলা হ'ল ওগুলো হবে বেশ চওড়া আর লম্বা। ফলে নৌকা-চলাচল করতে পারবে। কয়লা আর বালি কলকাতায় আসবে প্রচুর। তোমরা হয়তো জান রাঢ়দেশে বড় জলাভাব। যখন সমগ্র রাঢ়দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত খালে খালে ছেয়ে যাবে চারিদিক তখন জলাভাব আর থাকবে না এ দেশে।

খালগুলোয় আরও একটা কাজ হ'তে পারবে। সেটা হ'ল মাছের চাষ। সব থেকে আশ্চর্য হবে কিসে জান? বাঁধের জল থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

বিদ্যুতের মূল্য আজ যে কত তা তোমরা ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্পোন্নতির কথা পড়লে জানতে পারবে। আমাদের দেশের শিল্প বেশির ভাগ কুটিরশিল্প। এ শিল্পের অগ্রগতি নেই। আজ পশ্চিম দেশে শিল্প চলে যন্ত্রে। বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ যন্ত্রের শক্তি। শিল্পে পশ্চিমী দেশের সাথে পাল্লা দিতে হ'লে আমাদের কল বসাতে হবে, প্রচুর বিদ্যুতের সাহায্য নিতে হবে। সহজে ও সস্তায় বিদ্যুৎ তৈরি হ'তে পারে জল থেকে। কেমন ক'রে তাও বলি শোন।

দামোদরের বাঁধগুলো কংক্রিট দিয়ে তৈরি। তলা দিয়ে জল যাতায়াত করতে পারে। এক রকম লোহার ফটক কল দিয়ে তোলা যায় আবার নামান যায়। একে বলে 'স্লুইস' গেট। গেট ফেলে দিলে জল জলাধারে আটকে যায়। আবার তা তুলে দিলে জল নদীর গর্ভে গিয়ে পড়ে। জলাধারের জল যখন উপর থেকে নিচে নদীগর্ভে পড়ে তখন জলের স্রোত খুব বেগবান হয়। স্রোতের ভিতর একটা চাকা বসালে চাকা ঘোরে আর তাতে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। তারের মাধ্যমে এই জলবিদ্যুৎ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোকের ঘরে ঘরে যেতে পারে।

প্রত্যেকটি বাঁধের কাছে হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। তিলায়াতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়ে গেছে। কোনার, মাইথন আর পাঞ্চেটে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনার কথা

আছে। বোকারোতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। এখানে বাঁধ নেই, শুধু বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এখানে বিদ্যুৎ জল থেকে হয় না। তাপ থেকে তৈরি হয়। কয়লা জ্বালালে আগুন হয়। সেই আগুনের তাপ থেকে এখানে বিদ্যুৎ হয়। বিদ্যুতের কল্যাণে শিল্প ও শহর জাগবে গ্রাম গ্রামান্তরে। কল্পনা কর তো কি সুন্দর হবে সেসব! ধানবাদ শহরের নাম শুনেছ বোধ হয়। আসানসোল, তারপর সীতারামপুর। সীতারামপুর থেকে রেলপথ দু'টো ভাগ হয়ে গেছে। মেন লাইন পাটনা হয়ে মোগলসরাই যাচ্ছে আর গ্রান্ড কর্ড ধানবাদ, গুমো, গয়া, ডেরি-অন-শোন হয়ে মোগলসরাই গেছে। এই ধানবাদ থেকে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন, এক কথায় ডি ভি সি-র সকল কেন্দ্রে যাওয়া যায়।

আজকাল পুজো বা বড়দিনের ছুটিতে কলকাতার ভদ্রলোকেরা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে দামোদরের বাঁধ দেখতে যায়। বাপ-মাকে রাজী করাতে পার তো তোমরাও একবার যেও। মোটর নাই বা হ'ল। ট্রেনেও যেতে পার। কোডারমা স্টেশনে নামলে তিলায়া বাঁধে যাওয়া যায় আর কুমারডুবি স্টেশনে নামলে পাঞ্চেট ও মাইথনে যাওয়া যায়। গ্রান্ড কর্ড রেলপথে গোমো জংসন স্টেশন। এখান থেকে একটা পথ রাঁচি হাজারিবাগ আর পালামৌ পাহাড় অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ডেরি-অন-শোনে গ্রান্ড কর্ডের সাথে মিশে গেছে। এই পথের আশেপাশে আয়ার, কোনার, বোকারো ও বারমো বাঁধ। বোকারো স্টেশন বোকারো বাঁধের একদম গায়। টুক ক'রে ঘুরে আসতে পার এসব জায়গায়।

এত বড় একটা বিরাট অঞ্চলের ভিতর বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে শিল্প ও শহর গ'ড়ে উঠবে। দেশবিভাগের ফলে যে রকম উদ্বাস্তুর আমদানি ঘটছে তাতে ক'রে এইসব শিল্পকেন্দ্র ও শহরের আশেপাশে পুনর্বসতির ব্যবস্থা হ'তে পারবে। মোট কথা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। আধুনিক এবং উন্নত জীবনযাত্রার খোরাকও মিলবে।

বাঁধের জন্য পাশের জমিতে মাটি কাটা হয়। ফলে বাঁধের চারিপাশে কৃত্রিম হ্রদ গ'ড়ে উঠবে। তার এধারে ওধারে মানুষের শুধু বসতি তৈরি হ'তে পারবে তা নয়। আধুনিক জীবনযাত্রার নানা রকম সুব্যবস্থাও ঘটতে পারবে। যেমন ধর, স্বাস্থ্যনিবাস, আমোদপ্রমোদ, নৌবিহার, ক্রীড়াকৌতুক কেন্দ্র। এসব অনায়াসেই হ'তে পারবে। আর মজাও হবে খুব। কি বল! প্রাচীন কালের মত বন্যানিবারণ, জলসেচ ও জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা তো বজায় আছে। তা ছাড়াও আমরা কি কি পাচ্ছি তা তো বুঝতে পারছ। বন্যার দুঃস্বপ্ন, ম্যালেরিয়ার বিভীষিকা, আকালের হাতছানি সব বিদায় নিচ্ছে ধীরে ধীরে রাঢ় বাঙলার বুক থেকে। তার বদলে মাঠভরা সোনালী ফসলের আগমনী শোনা যাচ্ছে দামোদরের পাড়ে। ঐ দ্যাখো দামোদর চপলা মেয়ের মত পাথরের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে মাটির ধুলায় নামছে। কতটুকুই বা সে জলধারা কিন্তু কি দারুণ তার বেগ!

দু'পাড়ে মাঠ, ঘাট, বন, উপবন। নদী বয়ে যায় পাথুরে মাটির উপর দিয়ে। এ'কে বেঁকে ঘুরতে ঘুরতে কত পথ প্রান্তর পার হয়ে আসছে সাগরের পথে বাঙলার মাটির পানে। বিহার যেখানে শেষ হ'ল কুলটির কাছাকাছি, বর্ধমান জেলার মাটিতে দামোদর এসে প্রণাম জানাল বাঙলাদেশকে। যাত্রা তবুও থামে নি।

সারা বছর বালুকণার ভিতর স্বল্প মাত্র জল ঝির ঝির ক'রে বয়ে যায় আর বর্ষাবাদলে দিগন্ত বিস্তৃত দুই কূল ধ'রে বেগবতী জলধারা নিয়ে দামোদর ছোটে রাঢ় দেশের ভিতরে। সাগরে পড়বার আগে দামোদর পড়ে গঙ্গায়। আর সেই গঙ্গা গিয়ে মিশে সাগরের সাথে।

দামোদর দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন শ' ছত্রিশ মাইল। এর মধ্যে এক শ' ছাপ্পান্ন মাইল পথ বাঙলার ভিতর। এরই দু'ধারে নব জীবনের সাড়া জেগে উঠেছে। শস্য, স্বাস্থ্য ও শিল্পের সম্ভারে উথলে উঠছে দু'ধার। একবার দেখে এস, কেমন?

WBGP-57/8-5090F-5,250

सत्यमेव जयते